114

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 14. FEB. 1994 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ক্লোসড সাইনে ডাই-এর শেষ কোথায়?

তারেক শামসুর রেহমান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আবারও বন্ধ হয়ে গেছে। ক্লোসড সাইনে ডাই। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। কবে খুলবে। কেউ জানে না। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বলা হয়েছে হল ছেড়ে দিতে। মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে বিশ্ববিদ্যালয় আবার পরিণত হয়েছে বিরান এলাকায়। প্রথম পর্বের চূড়ান্ত পরীক্ষাও পিছিয়ে গেছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। কিন্তু কেন এমন হলো? ঘটনার সূত্রপাত গত ৮ ফেব্রুয়ারি। চর দখলের মতো একদল ছাত্র দখল করে নিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাস। পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী জাকসুর সাবেক সহ-সভাপতি কমান্ডো স্টাইলে পরিচালিত এই হল দখলের অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এখানে আরও একটি তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। গত বছরের ২৯ জুলাই-এর ঘটনার পর জাকসুর সাবেক সহ-সভাপতির নেতৃত্বাধীন ছাত্রদলের এই অংশটি ছাত্রদলের অপর অংশ কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছিল। জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্রদলের নেতৃত্ব স্থানীয় ও অস্থানীয়'র মাঝে বিভক্ত হয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। ২৯ জুলাই-এর ঘটনায় ছাত্রদলের একটা অংশ যারা অস্থানীয় হিসাবে পরিচিত, শিক্ষকদের প্রহারের অভিযোগে তারা অভিযুক্ত হলো। তাদের বিরুদ্ধে মামলা হলো। গ্রেফতার হলো কেউ কেউ। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলো দীর্ঘ এক শ' দিন। এই সুযোগে ক্যাম্পাস আবার চলে গেল স্থানীয়দের নেতৃত্বে। বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ এক শ' দিন বন্ধ থাকার পর আবার যখন খুললো, তখন দেখা গেল স্থানীয়রাই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে। অস্থানীয় নেতৃত্বকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢুকতে দেয়া হচ্ছিল না। এ নিয়ে উত্তেজনা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা, শিক্ষক সমিতি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে একটা বড় ধরনের সংঘর্ষের জন্ম হতে পারে। সরকারকে বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়েছিল। কিন্তু কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত শিক্ষকদের আশঙ্কাই বাস্তবে পরিণত হলো। অস্থানীয় গ্রুপ জাহাঙ্গীরনগরের ছাত্র রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্র বিন্দু আল- বেরুনী হল দখল করলো। পটকা ফুটলো। গুলি হলো। ভাঙচুর হলো। স্থানীয় গ্রুপ বিতাড়িত হলো সেই হল থেকে। তারা আশ্রয় নিল আরেকটি হলে। অবস্থান শক্তিশালী করলো তারা। সেই থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই এলাকা রয়েছে দুই গ্রুপের নিয়ন্ত্রণাধীনে। ফল যা হবার তাই হচ্ছিল। ভাঙচুর, গোলাগুলি আর সন্ত্রাসের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা আতঙ্কের মাঝে দিন কাটাচ্ছিল। এমনি এক পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিষদ সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

প্রশ্ন হচ্ছে এর শেষ কোথায়? এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ এক শ' দিন বন্ধ ছিল সন্ত্রাসের ঘটনায়। যে বিশ্ববিদ্যালয় এক সময় সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে পরিচিত ছিল, যেখানে কোন সেসন জট ছিল না, সেই বিশ্ববিদ্যালয় এখন সন্ত্রাসের শিকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন সেসন জট সৃষ্টি হয়েছে, শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে গেছে প্রায় বছর খানেক। যারা ১৯৯২ সালের শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েছিল, তারা এখনও তাদের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা শেষ করতে পারেনি। ১৯৯২-৯৩ সালের শিক্ষাবর্ষে যারা প্রথম বর্ষ সম্মানে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে, তারা পুরো একমাসও ক্লাশ করার সুযোগ পায়নি। ১৯৯৩-৯৪ সালের শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা কবে অনুষ্ঠিত হবে, তা কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৩-৯৪ সালের শিক্ষা বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যখন তারিখ ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই ঘটলো এই বিপত্তি। ভর্তি পরীক্ষাও এখন অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেল। আগামী জুন মাসে আরো একটি গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য পরীক্ষা দেবে। এরাই বা কবে নাগাদ জাহাঙ্গীরনগরে ভর্তি হতে আসবে, আমরা স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলতে পারছি না।

ছাত্রদলের মধ্যকার এই অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতি কি হবে তা এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা না গেলেও, ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ইতোমধ্যে ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা একটা শুভ দিক। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ইতোমধ্যে বিবদমান গ্রুপগুলোর সাথে বৈঠক করেছেন। তারা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলেও পত্র-পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তে বিবদমান দু'টো গ্রুপকে যার যার দখলকৃত হলে অবস্থান গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এটা সমস্যা সমাধানে আদৌ সহায়ক হবে কিনা, সে ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যায়। কেননা এর অর্থই হচ্ছে পরোক্ষভাবে স্থানীয় ও অস্থানীয়'র এই বিভক্তিকে স্বীকার করে নেয়া। ছাত্র রাজনীতির স্বার্থে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার স্বার্থে এ ধরনের কোন বিভক্তিকে উৎসাহ দেয়া ঠিক নয়। ছাত্র সে যেই হোক, তাকে স্থানীয় ও অস্থানীয় বলে যেমনি চিহ্নিত করা ঠিক নয়, ঠিক তেমনি ছাত্রদলের নেতৃত্বকেও বুঝতে হবে, স্থানীয় ও অস্থানীয় হিসাবে তারা বিভক্ত হতে পারে না। এতে তাদের মর্যাদা বাড়ে না, বরং তাদের প্রতি সাধারণ ছাত্রদের ঘৃণা বাড়তে পারে।

গুটি কয়েক ছাত্রের জন্য আজ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আক্রান্ত হয়ে উঠেছে। আজকে যারা অস্ত্রের বদৌলতে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে জিম্মি করে রেখেছে, তারা কতটুকু জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে পারছে, সেটা বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বারে বারে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। অতীতে বারে বারে মন্ত্রীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ঘটনায় হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। মন্ত্রীদের এই ভূমিকা শিক্ষা সমিতির সভায় একাধিকবার নিন্দা জানান হয়েছে। একজন মন্ত্রীকে শিক্ষক সমিতির সভায় 'পার্সন নন- গ্রাটা' হিসাবেও ঘোষণা করা হয়েছিল। গণতান্ত্রিক সরকারের একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির জন্য এটা ছিল একটা দুঃখজনক ঘটনা। তবুও সাধারণ শিক্ষক সমাজ আশা করেছিলেন, ২৯ জুলাই-এর ঘটনার রেশ শেষ হয়ে যাবে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে। কিন্তু সেটা সত্য বলে প্রমাণিত হলো না। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এখন ২৯ জুলাই-এর ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রদের জামিন বাতিল করার আহ্বান জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে না, এ কথাটা যেমনি সত্য, ঠিক তেমনি সত্য, বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রেখে সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। বরং তাতে করে ব্যাপক রক্তপাতের সম্ভাবনা ছিল। অতীতেও দেখা গেছে, ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতি সত্ত্বেও, তারা কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এমনকি পুলিশ শিক্ষকদেরকেও সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। সন্ত্রাসীদের সাথে পুলিশের যোগাযোগ রয়েছে। এটা তখন জোরেসোরেই ক্যাম্পাসে উচ্চারিত হয়। কারা ক্যাম্পাসে অস্ত্র আনে, কোথায় অস্ত্র গুদামজাত করা হয়, সন্ত্রাসীদের কারা আশ্রয় দেয়, এটা পুলিশের অজানা নয়। তবুও অস্ত্র উদ্ধারে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে পুলিশের কোন ভূমিকা নেই। পুলিশের এই ভূমিকা ক্যাম্পাসে পুলিশকে আরও বিতর্কিত করে তুলেছে।

বিষয়টি আজ এককভাবে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। যারা ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়েছিল এবং সুযোগ বুঝে পুনরায় ক্যাম্পাসে সশস্ত্র অবস্থায় ফিরে এসেছে, তারা ছাত্রদলেরই কর্মী ও নেতা। অন্যদিকে যারা ক্যাম্পাসে গত ছ' মাস রাজত্ব করেছে এবং যাদেরকে উৎখাত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, তারাও ছাত্রদলের সদস্য। সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ আজ ছাত্র দলকেই নিতে হবে। অতীতে দু'একজনকে দল থেকে বহিষ্কার করে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে সফলতা আসেনি। দ্বন্দ্ব রয়ে গিয়েছিল। এবারেও যদি সাময়িকভাবে একটা 'সমাধান' দেয়া হয়, তাতে যে স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত হবে, তা দিব্যি দিয়ে বলা যায় না। জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্রদলের ব্যাপারে একটা স্থায়ী সমাধান দরকার। না হলে ২৯ জুলাই কিংবা ৮ ফেব্রুয়ারির ঘটনা বারে বারে ঘটবে। ইতোমধ্যে জাহাঙ্গীরনগরের ঘটনাবলীতে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয়েছে। বিবিসি রেডিওতে এ খবর ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে। সরকারেরও এ ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী, বিশেষ করে বিএনপি'র সভানেত্রী হিসাবে বেগম খালেদা জিয়াও তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। সাধারণ শিক্ষকরা মনে করেন, একমাত্র প্রধানমন্ত্রীই পারেন তাঁর অঙ্গ সংগঠনের ছাত্রদের বিবাদ মেটাতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে রক্ত ঝরেছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছিলেন। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর বড় ধরনের রক্তপাত ঘটেনি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে আসবেন, এটা আমাদের কামনা। এটা সত্যিই দুঃখজনক যে, একজন প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত এসব ছোটখাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হয়। কিন্তু পরিস্থিতি আজ প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য করছে।

জাতীয় স্বার্থের কাছে ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থ কখনও বড় হতে পারে না। ক্যাম্পাসে গুজব রয়েছে, স্থানীয় ও অস্থানীয় গ্রুপের পিছনে জনৈক সংসদ সদস্য ও একজন মন্ত্রী জড়িত রয়েছেন। এরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উভয় গ্রুপকে ইন্ধন যোগাচ্ছেন। এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে তা বিএনপি'র জন্যও দুঃখজনক সংবাদ। মন্ত্রীদের মধ্যকার বিবাদের কারণে চট্টগ্রামে ও ঢাকায় সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে বিএনপি হেরে গেছে। চট্টগ্রামে বিএনপি'র কমিটি বাতিল করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেখানে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ঢাকাতেও পার্টিতে রদবদল হতে পারে বলে অনেকের ধারণা। এক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্রদলের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব সংগঠনটির জন্য আগামীতে কোন শুভ সংবাদ বয়ে আনতে নাও পারে। এ জিনিসটি আজ উপলব্ধি করা বড় প্রয়োজন।

আমরা চাই ক্যাম্পাসে সুস্থ পরিবেশ ফিরে আসুক। ফিরে আসুক শিক্ষার পরিবেশ। একজন শিক্ষকের দায়িত্ব তাঁর ছাত্রদের কাছে ফিরে যাওয়া। আমরা চাই আমাদের সেই অধিকারটুকু নিশ্চিত করা হোক। এটা আমাদের নাগরিক ও সামাজিক দায়িত্ব। এটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। ১২-২-৯৪